এই লেখাটি "দি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট" এর ষষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

আমার স্মৃতি ও কথা

এম.এ.বারী
(চিকিৎসা প্রাপ্ত ব্যক্তি)

আমার বয়স বিশের কিছু বেশী। আমার এই বিশ বছরের জীবন ও কিছু অর্জিত ধারণা নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে লিখতে বসলাম।

আমি ছিলাম একটু কাঁদুনি স্বভাবের ছেলে। যেমন, স্কুলে প্রথম দিন গিয়েই কাঁদা শুরু করলাম। তবে জীবনের প্রথম স্কুলে শিক্ষকদের ভালোই সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছিলাম। আমি বোধহয় আমার বিশ বছর জীবনের অন্যতম সেরা সময়টা কাটিয়েছি এই স্কুল জীবনে। কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি, আমি এই সময় অত্যন্ত আনন্দদায়ক আর তৃপ্তিকর যে কাজটা শিখেছিলাম তা হলো চুরি করা। আনন্দদায়ক ও তৃপ্তিকর একারণে বলছি যে আমরা চুরি করতাম ফল, বিশেষ করে পেঁপে। চুরি করা ছিল অত্যন্ত আনন্দদায়ক আর চুরির পর পেঁপে ঝালাই করে খাওয়া অত্যন্ত তৃপ্তিকর। সেই সময়েই আমি যেন পেয়ে গিয়েছিলাম নাবিক সিন্দাবাদের সমুদ্র অভিযানের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। আমার বাড়িতে অনেক পেঁপে হয় কিন্তু এই পেঁপে খাওয়ার ব্যাপারে ভীষণ অনীহা কাজ করতো। আচ্ছা আমি কি খুব বড় কোন অন্যায় করেছি? একজনের বাগানের অনেক পেঁপের থেকে ১/২টা চুরি করে খেয়েছি। কিন্তু আমাদের দেশে সেসব ভদ্রলোক যারা অত্যন্ত শৃঙ্খলা ও সততার সাথে ভাল রেজাল্ট করে বড় বড় পদে আসীন হয়ে বড় বড় চুরি করে অর্থাৎ দুর্নীতি করে, ঘুষ খায় তারা চোর নয়? কে চোর আর কে চোর না, তা কি করে বলি? এদেশে ছোট ছোট চোর যারা ভাতের জন্য, পেটের দায়ে বউ-সন্তানের কাপড়ের জন্য অর্থাৎ শুধু মাত্র জীবন বাঁচানোর জন্য চুরি করে– তাদের শাস্তি হয়। আর যারা বড় বড় চুরি করে গাড়ি কিনে, বড় সুন্দর প্রাসাদ বানায় তাদের আমরা সম্মান করি। আমার মাথায় এই বিষয়গুলো ঠিক ঢুকে না। আমার তো পেঁপের অভাব ছিল না। তাহলে পেঁপে চুরির জন্য আমারও শাস্তি হওয়া উচিৎ ছিল, হল না। শাস্তি যেহেতু হল না, তাই কারো কাছে ক্ষমা চাই। কিন্তু কার কাছে ক্ষমা চাইবো? কারণ যে মানুষের কাছে ক্ষমা চাইবো সে যে চোর না তার প্রমাণ কি?

ঐ সময়ের আরেকটা ঘটনা খুব মনে পড়ে। সেটা হচ্ছে মামার সাথে লুকিয়ে সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। আমাদের বাসায় টেলিভিশন ছিল। আশেপাশের অসংখ্য মানুষ প্রতি শুক্রবার দল বেঁধে সিনেমা দেখতে আসতো। একদিন টিভিতে দেখাচ্ছিল সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত ছবি "পথের পাঁচালী"। কোন নাচ নেই, গান নেই, মারামারি নেই– সবার সেকি বিরক্তি। দুটো কথা বলতে ইচ্ছে করছে, একজন দর্শক হিসেবে, সিনেমা বিশেষজ্ঞ হিসেবে নয়। আমাদের দেশে সিনেমা তৈরি হয় সেই একই কাহিনী, নায়ক-নায়িকা, ভিলেন এবং সময়ে সময়ে কাহিনীর প্রয়োজনে অনুল্লেখ্য। অভিনয়ে বৈচিত্র নেই, বৈচিত্র আছে শুধু পোষাকে। বিশেষ করে নায়িকার পোষাক এবং বিচিত্র কথার গান। সিনেমার কাহিনী কি শুধু একটি ছেলে আর একটি মেয়ের প্রেমকাহিনী? ভালবাসা শুধু একটা ছেলে আর একটা মেয়ের মধ্যেই হতে হবে? বাবা-মেয়ে, মা-পুত্র, ভাই-বোনের ভালবাসা, ভালবাসা নয়? পিতামাতা শেষ সম্বল জমিটি বিক্রি করে ছেলের পড়াশোনা বা ব্যাবসার জন্য টাকা দেয় বা মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দেয়, জানে যে দুদিন পরে অসহায় এক জীবন তার জন্য এগিয়ে আসছে। তারপরেও দেয় এই ভালবাসার মূল্য। এসব নিয়ে সিনেমা হয় না কেন? আমার স্মৃতি কথা বুঝি আর শুধু স্মৃতি কথা থাকছে না। স্মৃতির চেয়ে কথাই বেশী হয়ে যাচ্ছে। আসলে স্মৃতির পাশাপাশি আমার কিছু ধারণা, যুক্তি, প্রশ্নও বলছি। অষ্টম শ্রেণী থেকে আমার কিছু সমস্যা শুরু হয়। আমি প্রথমে নিজেকে কিছুটা শামুকের খোলসে আটকে রাখি। তারপর যখন কেউ বন্ধু হয়, কঠিন বন্ধুত্ব। আমাকে খোলস ছাড়াতে কেউ তখন সাহায্য করে না। বেশীর ভাগ সময় চুপচাপ বসে থাকতাম। গরীমার ফলাফল ভয়াবহ হতে শুরু হয়। আমি বেশীর ভাগ সময় চিন্তা করতাম। নানা রকম চিন্তা– ঘুরে বেড়ানোর চিন্তা, বন্ধুদের সাথে গল্প করার চিন্তা, দুষ্টামীর চিন্তা, ভালো রেজাল্ট করার চিন্তা ইত্যাদি। পরবর্তীতে চিন্তাগুলো এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না। আরো নানা রকম চিন্তা আসতে লাগলো। ছোট বেলা থেকেই একটু কল্পনাপ্রবন ছিলাম, অনেকটা কল্পনাবিলাসী। চিন্তাগুলো ধীরে ধীরে সমস্যার রূপ ধারণ করলো অনেকটা এইভাবে– প্রথমে চিন্তা আসে সুন্দর রূপ নিয়ে কিন্তু চিন্তা করতে করতে এক সময় আর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ভয়াবহ সব রূপ নিয়ে সেই ভালো চিন্তা আমার সামনে আসে। আমি ঠিক সহ্য করতে পারি না। ভয়াবহ খারাপ লাগে নিজেকে, মারতে ইচ্ছে করে। মাঝে মাঝে কাঁদি। অসহায় লাগে নিজেকে খুব। রাগ হয় প্রচন্ড। আমার পরিবারের অনেক মজার ছেলে ছিলাম আমি, দিন দিন গুটিয়ে যেতে লাগলাম। অবস্থা যখন বেশ গুরুতর তখন আমার মা বিষয়টা লক্ষ্য করলেন এবং প্রথমেই একজন কবিরাজের কাছে নিয়ে গেলেন। এই কবিরাজকে আমার ভাল লেগেছিল একারণে– তিনি আমার সমস্যা শুনে বলেছিলেন– এই সমস্যায় তার তেমন কিছু করার নেই, ডাক্তার দেখানোই উত্তম হবে।

নিয়ে যাওয়া হল ডাক্তারের কাছে। তিনি আমার রোগ চিহ্নিত করলেন ডিপ্রেশন নামে। প্রচুর ঔষধ দেয়া হল এবং কিছুদিন পর দেয়া হল ইঞ্জেকশন। ফলাফল যা হল দিনে রাতে ঘুমের পরিমান অসম্ভব বেড়ে গেল এবং চিন্তা সমস্যাও ভয়ঙ্কর রূপ লাভ করে। পড়াশোনার অবস্থা একেবারেই করুণ হয়ে যায়। এরপর কিছুদিন কিছুটা ভালো হলেও পরবর্তীতে আবার বেড়ে যায়। সবচেয়ে বড় কথা বার বার খারাপ রেজাল্ট করার কারণে আত্মবিশ্বাস শূণ্যের কোঠায় পৌছায়।

এরপর অবস্থা যা হয়, নতুন নতুন চিন্তা মাথায় আসতে থাকে। সমস্যা ঘনিভূত হতে থাকে। ইঞ্জেকশনটা নিজে নিজে বন্ধ করে দেই। যদিও আগের মতো এত বেশী ঘুম হতো না। আবার সিদ্ধান্ত নিলাম ডাক্তার দেখাবো। বড় মামা ঢাকায় নিয়ে আসে আমাকে, আরো উন্নত চিকিৎসার

খোঁজ নেন। বাংলাদেশে কিছুটা নতুন মনোচিকিৎসা 'সাইকোথেরাপী' করানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।

বেশ কিছুদিন ধরে থেরাপী নিলাম, ঔষুধ পত্র সব বন্ধ করে। হ্যাঁ এখন অবস্থা বেশ ভালো। চিন্তাগুলোকে আর তেমন পাত্তা দেই না। আল্লাহ্ ভাগ্যে যা রেখেছন তাই হবে। তবে ভালো আছি। সুস্থ হচ্ছি মনে হচ্ছে। আমার বন্ধুবান্ধব দুচারজন হয়েছে ঘরে এবং বাইরে।

আমি ব্যক্তি হিসেবে খুব আবেগপ্রবন ছিলাম। তবে নিজের আবেগকে এখন নিয়ন্ত্রণ করতে জানি। পরিবারের সব মানুষের ভালোবাসা ফিরে পেয়েছি। একজন সুন্দরী মেয়ে যে আমাকে পাত্তা দেয় না, পছন্দ করে না, বা ভালোবাসে না, তাদের কাছে বসে নানা রকম আলাপ করে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করার চেয়ে আমার কাছে আমার দাদা-দাদী, নানা-নানী পরিবারের ভালোবাসার মূল্য বেশ খানিকটা বেশী। একে যদি কেউ 'শেয়ালের আঙ্গুর ফল টক' বলে তাকে বলতে চাই– সত্যিকারের ভালোবাসার মূল্যই আমার কাছে ভিন্ন ও অনেক বেশী। যাদের মধ্যে ভালোবাসা হবে তাদের দুজনের মধ্যে ভালোবাসা হতে হবে। তবে কে কাকে ভালোবাসবে, না বাসবে– এটা তার অধিকার। অবশ্য একে বলা যায় মনের অধিকার। আর আমার ধারণা ভালোবাসার ক্ষেত্রে মনকেই প্রাধান্য দেয়া উচিৎ।

যাই হোক তাকিয়ে আছি ভবিষ্যতের দিকে। আমার থেরাপিষ্ট এর কাছ থেকে বুঝতে পেরেছিলাম আমার সমস্যাটা চিন্তার। ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই, ভবিষ্যত যখন বর্তমান হয়ে সামনে দাঁড়াবে তখনই দেখা যাবে। জীবনে যদি বড় কিছু হতে না পারি তবে দাদার বাড়ি গিয়ে জমি চাষ করে খেতেও আপত্তি নেই– স্বাভাবিক জীবনটা পেলেই হলো। আমার কাছে স্বাভাবিক সুন্দর জীবনটা আগে। তারপর প্রতিষ্ঠা। সুন্দর জীবনের জন্যই তো প্রতিষ্ঠা। অন্তত এখন পর্যন্ত আমার জীবন সম্পর্কে বিশ্বাস–তাই।

থেরাপী জিনিসটা বেশ কাজে দিয়েছে। কিছু কিছু অদ্ভুদ চিন্তা বা অভ্যাস আমাকে ধরিয়ে দেয়া হচ্ছিল। আর আমি ধীরে ধীরে নিজের চেষ্টায় সেগুলো সারাচ্ছিলাম। ফিরে পাচ্ছি হারানো আত্মবিশ্বাস। মনে হয় বের হয়ে আসছি সেই বিভীষিকাময় জীবন থেকে।

লেখক পরিচিতি

বর্তমানে লেখাটির লেখক এম. এ. বারী একজন ছাত্র। উনিদির্ঘদিন যাবৎ মানসিক সমস্যায় কষ্ট পেয়েছেন। বর্তমান লেখায় তিনি নিজের কষ্টের কথা এবং কিভাবে এর থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে পেলেন সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

সম্পাদকের নোট

এ লেখায় লেখক স্বতস্ফূর্ত ভাবে তার মনের কথা তুলে ধরেছেন। লেখাটি পেশাদারী লেখা নয়। এটি এক ধরণের আত্মকাহিনী। 'দি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী লেখকের হুবহু লেখাটি প্রকাশ করলেন। তার মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়।

Depressed individuals struggle in silence, waiting for nearly one year befor seeking professional help. But in another estimated found that in US, 58% of people with depression are not identified or adequately treated in health care settings.

Also depression may be and independent risk factors for death in patients who have experienced a heart-attack and in others with Coronary heart disease.